



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 608 - 614

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

পরিবেশবাদ এবং সাঁওতাল জনজাতির মূল্যবোধ

মল্লিকা ব্যানার্জী

গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

গুরু ঘাসিদাস বিশ্ববিদ্যালয়, বিলাসপুর, ছত্তিশগড়

Email ID : mbanerjee1982@gmail.com

ও

ড. পায়েল ব্যানার্জী

সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

গুরু ঘাসিদাস বিশ্ববিদ্যালয়, বিলাসপুর, ছত্তিশগড়

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Environment,
Environmentalism,
Deep ecology,
Ethics, Santhal
Community,
Disam, Forest
management,
Water management,
Sustainability.

Abstract

Environmentalism evolved as a critical response to the degradation of natural ecosystem as a result of scientific and social activism. This movement sought to change the interaction between people and natural environment to achieve ecological balance and sustainability. From the very early period of Civilization human are used to exploit nature to fulfill their own needs and gradually it's intensifying their control over natural settings with the advancement of industrial and technological development. However this dominance led to serious environmental imbalances. In response to this degradation, various scientific platform and social groups started movements to promote environmental preservation followed by the principles of deep ecology and ecological ethics.

Environmental ethics of indigenous communities offer an important alternative framework for comprehending this movement to achieve sustainable coexistence. Santhal community from eastern India is notable because of their deeply rooted environmental ethics that permeate within their everyday life, culture and socio-ecological customs. This community maintains a strong world view that humans are the part of nature, not above it. Their approaches for using natural resources, water management, farming, forest management show an intense symbiotic relationship with the nature. This paper shows how the development of human society led to environmental degradation while emphasizing the importance of indigenous traditional knowledge in restoration of environment. It examines how the cultural practices of santhal community protect the environment through the lens of constructivism and environmental sociology. This paper not only focuses upon the philosophical base of environmentalism among the santhal community but also focus on their indigenous ethos in environmental restoration. In the contemporary period when most of the environmental activities are

disconnected from the grassroots, the lived experience of this community provides a grounded and holistic approach for sustainable environmental well-being.

Discussion

সালটা ১৯৭২, সুইডেনের স্টকহোম শহরে অনুষ্ঠিত হল জাতিসংঘের মানব পরিবেশ বিষয়ক প্রথম সম্মেলন। এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সার্বিক পরিবেশের স্থায়িত্ব অর্জনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। স্টকহোম সম্মেলনের সামগ্রিক আলোচনার নির্যাস নিয়ে তৈরি হয় স্টকহোম ডিক্লারেশন, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ, দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়। এই সম্মেলনের হাত ধরেই পরিবেশগত স্থায়িত্ব অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিকাঠামো গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিবেশগত দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। স্টকহোম সম্মেলনের প্রভাব পরবর্তী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চুক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।^১ যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে এত আলোচনা, নীতি প্রণয়ন পরিবেশের অবনতি রোধে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। বরং পরিবেশ ধীরে ধীরে আরও অসহায় ও কলুসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যিই কি উনবিংশ শতকের এই সম্মেলন মানুষকে প্রথম সচেতন হতে সাহায্য করেছে পরিবেশ সম্পর্কে নাকি মানুষ বহু পূর্বেই বুঝতে পেরেছিল যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাই মানুষের কাছে একদিন মুখ্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

এখন প্রশ্ন হল পরিবেশ কি এবং কেনো পরিবেশ সচেতনতা বর্তমানে এতো গুরুত্বপূর্ণ? পরিবেশ হল একটি সমন্বিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত জৈব ও অজৈব উপাদান পারস্পরিক ভারসাম্য অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ভৌত উপাদান যেমন - ভূ-প্রকৃতি, শিলার গঠন, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জল, মৃত্তিকা একদিকে যেমন পরিবেশের প্রধান নির্ধারক তেমনি মানুষের ক্রিয়াকলাপ পরিবেশের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক। সভ্যতার আদিম পর্ব থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে এসেছে এবং পরোক্ষ প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করেছে। আদিম জীবিকা সত্তাভিত্তিক মানুষেরা প্রধানত শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমেই নিজেদের জীবন জীবিকা অতিবাহিত করত। এই সময় তারা সম্পূর্ণরূপেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করত। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের যে সূক্ষ্মতা তা তারা অনুভব করেছিল যখন তারা দেখেছিল আগুনের ব্যবহার এবং অতিরিক্ত মাত্রায় শিকার কিভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে। আজ থেকে প্রায় ৫০,০০০ - ৯০০০ খৃষ্টাব্দ আগে পৃথিবী থেকে প্রায় ১৭৮টি বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। বহু গবেষণা পত্রে এই বিলুপ্তিকে প্রাকৃতিক বিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, ১৯৬৬ সালে জীবাশ্মবিদ পি.এস.মার্টিন তার 'ওভার কিল হাইপোথিসিস' এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী থেকে বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবলুপ্তির জন্য মানুষ দায়ী। এর পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষকে স্থায়ী বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ভারসাম্য রেখে খাদ্য উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করতে কৃষি কাজের সম্প্রসারণ শুরু হয়।^২ এই সময় ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে কৃষিকাজের সম্প্রসারণের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র বিনষ্ট হয়। অতিরিক্ত বৃক্ষ ছেদন এবং কৃষি কাজের চাপের ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তৎকালীন গ্রীস প্রশাসনের কাছে, যা দেখে দার্শনিক প্লেটো দুঃখ করে বলেছিলেন সমস্ত উর্বর অংশগুলো পৃথিবী থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এক কঙ্কালসার পৃথিবী তৈরী হচ্ছে।^৩

১৭৭৮ সালে ফরাসি প্রকৃতিবিদ জর্জেস লুই লেক্লার্ক প্রকৃতির উপর মানুষের এই নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণকে উপলব্ধি করে উল্লেখ করেন যে, মানুষ পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করেছে কিন্তু কোন কিছুই পুনরুৎপাদন করার প্রচেষ্টা করেনি। পরবর্তীতে, ১৮৫৯ সালে ডারউইন তার 'Origin of Species' নিবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত জীব প্রজাতি একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং নির্দিষ্ট বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্গত। অর্থাৎ একটি জীবের অবলুপ্তি প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশের অন্যান্য জীবকে প্রভাবিত করে। এই বিলুপ্তির ইতিহাস আরো ভয়ংকর ও প্রবল হয়ে ওঠে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশের গঠনকে বিঘ্নিত করে। এবং মানুষ এই পরিবর্তনকে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার জয় হিসেবে দেখতে শুরু করে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নিবিড়তা ও প্রকৃতির খামখেয়ালি মনোভাব থেকে মানুষ বুঝতে শুরু করে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। মানুষ যদি সচেতন পদক্ষেপ

গ্রহণ না করে তবে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মসূচীই প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। এই সময় বহু গবেষণামূলক নিবন্ধে প্রকৃতির উপর প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। ১৯২৯ সালে বাস্তুবিদ ফ্রান্সিস রাটক্লিফ অস্ট্রেলিয়ার মৃত্তিকা ক্ষয়কে কেন্দ্র করে লেখেন তার বিখ্যাত বই *Flying Fox and Drifting Sand*. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কৃষিক্ষেত্রে সিস্টেটিক পেস্টিসাইড প্রয়োগের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ব্যাখ্যা করে রাতেল কার্সন রচনা করেন *Silent Spring*। ১৯৯৬ সালে থিও কলবর্ন রচনা করলেন *Our Stolen Future*, যেখানে তিনি পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের উপর রাসায়নিক দূষকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন।^৪ যদিও বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকৃতির চরিত্রগত পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব ফেললেও, বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি বরং ৯০ এর দশকে মুক্ত বাণিজ্যের আবহাওয়ায় তারা তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে আরো সম্প্রসারিত করে এবং যার সাথে তাল মিলিয়ে সমানুপাতিক হারে পরিবেশে দূষণের মাত্রাও বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, জমির ব্যবহারিক পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত পরিমাণে দূষণ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গঠন সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। এবং এই ভাবনার ফলশ্রুতিতেই আত্মপ্রকাশ করে পরিবেশবাদ ও আন্তরাষ্ট্রীয় পরিবেশবাদী নীতি প্রণয়নের ধারাপাত।

পরিবেশবাদ ও তার বিবর্তন : পরিবেশবাদ একটি মতাদর্শ যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পরিবেশগত অবক্ষয়ের প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে তত্ত্ব গঠন, প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের পর্যালোচনা এবং পরিবেশের সুস্থায়িত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে এই মতাদর্শ বিকাশ লাভ করেছে। পরিবেশবাদ প্রধানত দুটি ভিন্ন ভাবধারার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছেঃ প্রথমত যারা মানুষের কল্যাণের জন্য প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে চায় (মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি) এবং দ্বিতীয়ত যারা পৃথিবীতে প্রকৃতির অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে চায় (পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি)। ১৯৭৩ সালে, আর্নে নেসের নিবন্ধ, “The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary,” পরিবেশবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করেছিল। এই নিবন্ধে অগভীর (Shallow) এবং গভীর (Deep) বাস্তুবিদ্যার উল্লেখ করা হয়। অগভীর বাস্তুবিদ্যার (Shallow Ecology) মাধ্যমে একটি বাস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরা হয়, যা মূলধারার পরিবেশ আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়। নেস এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রধানত মানবকেন্দ্রিক ভাবধারা থেকে ব্যাক্ত করেছেন, যার মূল বক্তব্য হল পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন কারণ তা মানুষের সার্বিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। এই দর্শন বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যেমন দূষণ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, নবীকরনযোগ্য সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। অর্থাৎ, সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার ব্যবস্থাপনাই হল অগভীর বাস্তুবিদ্যার প্রধান দর্শন। অপরপক্ষে, গভীর বাস্তুবিদ্যার (Deep Ecology) মাধ্যমে পৃথিবীতে সমস্ত জৈব এবং অজৈব উপাদানের সমান অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব সমানভাবে মূল্যবান। মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে অন্যান্য জীব বা অন্যান্য ভূ-প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর প্রভাব খাটাতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র পরিবেশের সংরক্ষণের জন্য মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের উপর এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মাধ্যমেই প্রকৃতঅর্থে পরিবেশের সংরক্ষণ সম্ভব বলে মনে করে।^৫

পরবর্তীকালে, রিলে ডানলপ ও উইলিয়াম কাটন (১৯৯৪) তাদের পরিবেশগত সমাজবিদ্যা মতবাদের (Environmental Sociology) মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ, শিক্ষা, নৈতিক আচরণ, সামাজিক কাঠামোর ওপর বিশেষ জোড় দিয়েছিলেন। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তুলনায় সামাজিক বা গোষ্ঠীভিত্তিক প্রচেষ্টাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধে বারংবার পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের গুরুত্বকে পর্যালোচনা করেই একবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই বিভিন্ন আলোচনা চক্রে পরিবেশ সংরক্ষণে স্থানীয় তথা বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাদেশিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা উঠে এসেছে। এবং পরিবেশবাদীদের মধ্যেও ক্রমশ এই উপলব্ধি দৃঢ় হয়েছে যে, সুস্থায়ী পৃথিবী গঠনের ক্ষেত্রে এই জ্ঞানের প্রয়োগ অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জমির ব্যবহারিক পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা পূরণ, বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়ে শতাব্দী প্রাচীন এই জ্ঞান অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে –

“We must preserve and strengthen indigenous practices, which contribute to sustainable environmental management and provide leadership in combating environmental calamities.”^৬

অর্থাৎ সুস্থায়ী পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় এবং পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবিলায় ক্ষেত্রে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনুশীলনকৃত কার্যধারাকে আমাদের সংরক্ষণ এবং শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

সুস্থায়ী উন্নয়নের কর্মসূচিতে আদিবাসী সম্প্রদায়কে প্রকৃতির অন্যতম প্রধান সংরক্ষক এবং পুনরুদ্ধারকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং তাদের উপলব্ধ জ্ঞানকে পরিবেশ সংরক্ষণে অন্যতম কার্যকরী উপাদান হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়কেই সুনির্দিষ্ট একটি বাস্তবাত্মক কাঠামোর অন্তর্গত বলে মনে করে। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে অবস্থিত প্রায় ৩৭০ মিলিয়ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বহন করে চলেছে। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যই আদিবাসী মানুষদের আচরণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজনের ভাবধারা এবং বিশ্বের প্রতি ইতিবাচক দর্শন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই দর্শনের মাধ্যমে আদিবাসীরা পরিবেশকে আত্মস্থ করতে এবং পরিবেশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক বিভিন্ন সম্পদ যেমন জঙ্গল, জমি, জল শুধুমাত্র আদিবাসীদের পরিচয় নয় বরং অস্তিত্বের চিহ্নও বহন করে। যদিও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই মানুষেরা উন্নয়ন থেকে দূরে, দারিদ্র্যতাকে সঙ্গ করে, সমাজের প্রান্তিক কাঠামোয় বসবাস করে। উন্নয়ন থেকে বিচ্যুত এই মানুষদের প্রধান সম্বল হল তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের সাথে তাদের একাত্মবোধ। প্রকৃতির সাথে আদিবাসীদের এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সম্পর্ক প্রকৃতির সুস্থায়ী আরক্ষণের এক অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ২০২২ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত হওয়া স্টকহোম+৫০ আলোচনাচক্রেও আদিবাসী জ্ঞানের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয় এবং বিভিন্ন নীতি এবং কার্যক্রমের মধ্যে এই জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। সারাবিশ্বে প্রায় ৫০০০ টিরও বেশি বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। এই প্রতিটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অবয়ব রয়েছে। বহির্বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোকে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে গড়ে তোলা তথা পরিবেশ ও সমাজের প্রতি গঠনমূলক আচরণ গঠনে এই সংস্কৃতি অন্যতম মুখ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে^৭। আদিবাসীরা তাদের এই বিশ্ব দর্শন এর মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সম্পর্ককে নিবিড় করে তোলে।^৮ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান যেমন বনভূমি, জমি, প্রাণী সম্পদ ও জলাশয়কে এরা পবিত্র বলে মনে করে।^৯ প্রকৃতির সাথে এই বন্ধন আদিবাসীদের শুধু পরিচয় নয় বরং তাদের অস্তিত্বের মানদণ্ডকে প্রকাশ করে।^{১০} স্বতন্ত্র সংরক্ষণশীল সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং পরিবেশকে উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি পরিবেশের প্রতি আদিবাসীদের সুস্থায়িত্বপূর্ণ মনোভাবকেই ব্যক্ত করে।^{১১}

ভারতবর্ষের বহু জনগোষ্ঠী এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই প্রকৃতির কোলে সুস্থায়ীভাবে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। এই প্রবন্ধে পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের পরিবেশবাদী দর্শন এবং প্রাদেশিক জ্ঞানকে তুলে ধরা হল।

সাঁওতাল জনজাতি এবং পরিবেশবাদ : সাঁওতাল হল পূর্ব ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বনভূমিকে কেন্দ্র করেই নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে থাকে। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বনভূমি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের থেকে বনভূমিতে প্রবেশ ও তার ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেয়। বিশেষত ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বন আইন এবং ১৯২৭ সালের বন আইন আদিবাসীদের জঙ্গল ব্যবহারের অধিকারকে ব্যাপক ভাবে সীমিত করে তোলে। মূলত বনভূমির উপর একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার স্বার্থেই ব্রিটিশ

সরকার এরূপ আইন প্রণয়ন করে। যার ফলে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে সাথে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীও তাদের ঐতিহ্যগত জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের পর, বন সংরক্ষণের সাথে আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য আনতে বনভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত বহু নীতিগত পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে বনভূমি সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়। এবং এর পরবর্তীকালে ২০০৬ সালে বন অধিকার আইনের মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে ঐতিহ্যগত ভাবে বনভূমি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়, যা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কাছেও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়।^{১২}

সাঁওতালদের ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং সাংস্কৃতিক অবয়বের মধ্যে বনভূমির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তারা পবিত্র উপবন (Sacred Groves) নির্মাণের মাধ্যমে বনভূমিকে সংরক্ষণ করে থাকে। এই পবিত্র উপবন হল বনভূমির একটি বিশেষ অংশ, যেখানে দেবতাদের সাথে তাদের পূর্বপুরুষের আত্মার নিবাস বলে সাঁওতালরা মনে করে এবং এই অঞ্চলে গাছ কাটা ও পশু, পাখি শিকার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গি বনভূমির প্রতি সাঁওতালদের গভীর শ্রদ্ধাকে ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ বনভূমি তাদের কাছে শুধু সম্পদ নয় বরং তাদের পরিচয় এবং তাদের জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বনভূমি এবং তাকে কেন্দ্র করে জীবন সাঁওতালদেরকে এক নতুন পরিচয় বহনে সহায়তা করে। সাঁওতালদের গানের মাধ্যমেও এই দর্শন ফুটে ওঠে। যেমন -

অরণ্যের ডাক পড়েছে, জীবন এই বনের ভিতরে
 গাছের তলায় নাচি আমরা, হারানো গানের সুরে।
 পাথরের তলায় জল আছে, ধারা আছে মাটির গভীরে
 বনের রক্ষা আমাদের কর্তব্য, পৃথিবী যেন থাকে সুখে।

(সাঁওতালি গানের বাংলা তর্জমা)

ভারতের এই বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশগত জ্ঞান, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং অন্ত-সম্প্রদায় ভিত্তিক অনুশাসনের মাধ্যমে বনভূমির সাথে একটি গভীর এবং সহাবস্থানীয় সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। সাঁওতালরা মূলত সারনা ধর্মের অনুসারী, যেখানে প্রকৃতিকে দেবতা অর্থাৎ এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে পূজো করা হয়। এবং তারা মনে করে যে প্রকৃতির সমস্ত সজীব এবং নির্জীব উপাদান এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যে সহাবস্থান করে রয়েছে। তবে পরিবেশের সমস্ত উপাদান ও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা মূলত দিশম (Disam) শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই দিশম পরিবেশের সামগ্রিক বাস্তবতাকে তুলে ধরে এবং সজীব (Gibit) ও নির্জীব (Goyet) জগতের পারস্পরিক সম্পর্ককে সূচিত করে। সাঁওতালদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশে বিকাশ লাভ করে। প্রাকৃতিক উপাদানের এই বিকাশে মানুষের কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ নেই বরং প্রাকৃতিক উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মা। প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ আগুন, জল, আকাশ, উদ্ভিদ, ভূমি নিজস্ব সত্তা নিয়েই পরিবেশে বর্তমান। তদুপরি নির্মিত উপাদান তথা মানুষের তৈরি ঘর, রাস্তা, দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র ও অন্যান্য পরিকাঠামো মানুষ দ্বারা নির্মিত নির্জীব স্থাবর উপাদান। তবে পরিবেশের প্রতি আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যবোধের উপস্থিতির কারণে সাঁওতালরা সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান এবং মানুষের তৈরি উপাদানকে জীবন্ত বলেই বিবেচনা করে থাকে।

এই আধ্যাত্মিকতা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই সাঁওতালরা বনভূমিকে পবিত্র স্থান (জাহেরস্থান) হিসেবে বিশ্বাস করে। এই স্থান তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র যেখানে তারা মারাং বুরু (মহান পর্বতের আত্মা) এবং জাহের যুগের (পৃথিবীর দেবী) আরাধনা করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রথাগত অলিখিত আইনের মাধ্যমে বনকে সংরক্ষণ করা হয়, যা সুস্থায়ী বন ব্যবস্থাপনাকে নিশ্চিত করে এবং অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ প্রতিহত করে। আবার ‘কিরি ও বোঙ্গ’ (প্রকৃতি ও আত্মা) নীতি অনুসারে বলা হয় যে, প্রয়োজনের বাইরে বনের ক্ষতি করা দুর্ভাগ্যকে আমন্ত্রণ জানায়, যা সাঁওতালদের স্ব-আরোপিত পরিবেশগত নীতিকে আরও শক্তিশালী করে। বর্তমানে সাঁওতালরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ বন ব্যবস্থাপনায় (Joint Forest Management) সক্রিয়ভাবে জড়িত। এবং সরকারের সাথে সহযোগিতায় কাঠবিহীন বনজ দ্রব্য (Non-timber Forest Product) সংগ্রহে এবং সুস্থায়ী বনভূমি সংরক্ষণ এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বনভূমি সংরক্ষণ শুধু নয় সাঁওতাল সম্প্রদায় জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সুস্থায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এবং এই ব্যবস্থাপনা তাদের কৃষি পদ্ধতি, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। নদী, পুকুর তথা যে কোন জলধারাই তাদের কাছে পবিত্র। প্রাকৃতিক জলাশয়কে সংরক্ষণ করার সাথে সাথে সাঁওতালরা কৃত্রিম জলাশয় নির্মাণ করেও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এমনকি ভূগর্ভস্থ জলের স্থায়িত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বনভূমি ব্যবস্থাপনার যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে সাঁওতালরা সে সম্পর্কেও অবগত। সোহরাই এবং বাহার মতো উৎসবে বৃষ্টি এবং কৃষিকাজে সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়, যা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির সাথে সাঁওতালদের আত্মবোধকে স্বীকৃতি দেয়। তবে সামগ্রিকভাবে জলসম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাঁওতালরা সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। লোকগীতি এবং গল্পসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে জলের গুরুত্ব এবং জলের অস্থিতিশীল ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করে থাকে, যা পরিবেশগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার।^{১০}

বনভূমি ও জলসম্পদ ছাড়াও সামগ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাঁওতালদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের প্রাদেশিক জ্ঞান, সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাকারী মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে। তাদের কৃষি ব্যবস্থায় মিশ্র চাষ, জৈব চাষ এবং প্রাকৃতিক কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া হয়, যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে এবং পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করতে বিশেষভাবে সহায়ক। তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাস প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত শোষণকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সম্পদের পরিমিত ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

উপসংহার : তবে বর্তমানে অতিরিক্ত পরিমাণে বনচ্ছেদন, শিল্পের জন্য জমি দখল, খনন, বাস্তুচ্যুতি এবং বন অধিকার আইনের (২০০৬) জটিলতার কারণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রা অনেকটাই বিঘ্নিত। উপরন্তু জলবায়ু পরিবর্তন সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থা এবং বনভূমির কাঠামোকে আরো দুর্বল করে তুলছে। এই চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও প্রকৃতির সাথে সুস্থায়ী সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সাঁওতাল দর্শন মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যা পরিবেশের সাথে একাত্মবোধ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দর্শন এবং জীবনধারা পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তারা যে পরিবেশমুখী জীবনধারা অনুসরণ করে, তা কেবল পরিবেশে টিকে থাকার কৌশল নয়, বরং পরিবেশের সঙ্গে এক আন্তরিক বোঝাপড়ার বহিঃপ্রকাশ।

বর্তমান যুগে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন বনচ্ছেদন, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে, সেখানে সাঁওতালদের পরিবেশবাদী দর্শন ও জীবনধারা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তাদের সুস্থায়ী জীবন পদ্ধতি কেবলমাত্র স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়েই নয়, বরং বৃহত্তর পরিবেশ নীতি গঠন করার ক্ষেত্রেও এই দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পরিবেশকে সুস্থায়ী রূপ প্রদান করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাদেশিক জ্ঞানকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণা দেয় না বরং মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে একটি ভারসাম্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে শেখায়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক মূল্যবান আদর্শবাদী শিক্ষার ক্ষেত্র হতে পারে।

Reference:

1. Handl, Günther, Declaration of the United Nations conference on the human environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992, *United Nations Audiovisual Library of International Law*, 2012, P. 5
2. Brosimmer, Franz, *Ecocide: A Short History of Mass Extinction of Species*, Pluto Press, 2012, P. 19, P. 129, P. 130
3. Sayem, Abu, *Philosophical Roots of Our Environmental Problem*, International Journal of the Asian Philosophical Association, 2021, P. 158
8. Radhakrishnan, Ganesh, *The Role of Literature in Shaping Environmental Consciousness*, *Advances in Consumer Research*, 2025, P. 28

৫. Naess, Arne, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary, Inquiry, 1973, P. 95
৬. Ubala, Sourabh, et al., Cultural Roots of Conservation: Indigenous Knowledge in Environmental Sustainability, Indian Journal of Integrated Research in Law, 2019. P. 420
৭. United Nations Environment Programme. Division of Early Warning, and Assessment, *UNEP year book 2011: emerging issues in our global environment*, UNEP/Earthprint, 2011, P. xviii
৮. Timoti, Puke, et al., A representation of a Tuawhenua worldview guides environmental conservation, *Ecology and Society*, 2017, P. 5
৯. Maffi, Luisa, Linking language and environment: A coevolutionary perspective, *New directions in anthropology and environment: Intersections*, 2001, P. 32
১০. Altman, Daniel, et al, Anterior colporrhaphy versus transvaginal mesh for pelvic-organ prolapse, New England Journal of Medicine, 2011, P. 1829
১১. Grieves, Vicki, Aboriginal spirituality: Aboriginal philosophy, the basis of Aboriginal social and emotional wellbeing, Vol. 9. Darwin: Cooperative Research Centre for Aboriginal Health, 2009, P. 7
১২. Chakraborty, Parikshit, Socio-Cultural Aspects of Sacred Grove: The Study of Santal Village, EAS Journal of Humanities and Cultural Studies, 2019, P. 51
১৩. Tengö, Maria, et al., Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—lessons learned for sustainability, Current opinion in environmental sustainability, 2017, P. 29

Bibliography:

- টুডু, বুদ্ধেশ্বর, সাঁওতাল জাতির ইতিহাস, আনন্দ প্রকাশন, প্রকাশকাল - ১৯৯৮
- পাল, সুভাষ, সাঁওতাল উপকথা, প্রভা প্রকাশন, প্রকাশকাল - ২০০৬
- টুডু, বুদ্ধেশ্বর, সাঁওতাল-মহান পরম্পরার অনুসন্ধানে ব্যস্ত এক মহান জাতির কথা, আনন্দ প্রকাশন, প্রকাশকাল- ১৯৯৬
- ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, সাঁওতাল গান ও কবিতা সংকলন, সাহিত্য অকাদেমি, প্রকাশকাল - ২০১২
- ভট্টাচার্য, নন্দলাল, সাঁওতাল লোককথা, বেস্ট বুকস, প্রকাশকাল - ১৯৫৮
- Carson, Rachel, Silent Spring, 1st Edition, Penguin Books, London, Reprinted in Penguin Classics, 2000, P. 23
- Van Opstal, Maarten, and Jean Hugé, Knowledge for sustainable development: a worldviews perspective, Environment, Development and sustainability, 2013, P. 703